সিঙুড়বুনিয়া ও সুন্দরবনের স্মৃতি

আজ আপনাদের নতুন এক গ্রামের গল্প বলবো। সেই গ্রামের নাম সিঙুড়বুনিয়া। এমন কোনো গ্রামের নাম আগে কখনো শুনেছেন কি? আমিও চিনতাম না। আমাদের দেশে কত হাজারও নামের গ্রামে আছে! সিঙুড়বুনিয়া তেমন এক গ্রাম। বিদ্যুৎ নেই। চারদিকে থৈ থৈ পানি। জোৎস্নার আলো সেই পানিতে পড়লে এক জাদুবাস্তব জগৎ তৈরি হয়।

নিবিড় চৌধুরী

সিঙুড়বুনিয়ায় যাওয়াটাও অত সহজ নয়। ঢাকার কল্যাণপুর থেকে প্রথমে আপনাকে টিকিট কাটতে হবে খুলনার। এতটুকু খুবই সহজ। খুলনা সদর থেকে লোকাল বাসে করে যেতে হবে বাগেরহাটের রামপাল। ১৩০-১৫০ টাকা ভাড়া নেবে জনপ্রতি। নিয়মিত বিরতিতেই বাস ছাড়ে রামপালের উদ্দেশে। রামপালে যাওয়ার পথে পড়বে ভাঙ্গা নামে একটি স্থান। ড্রাইভার বা হেল্পারকে সেখানে নামিয়ে দিতে আগেই বলে রাখবেন। এরপর সেখান থেকে ভ্যানে চড়ে যাবেন মোংলা নদীর পাড়ে। দেখবেন সেখানে নৌকা আপনার অপেক্ষায়। একটাতে উঠে বসলেই নিয়ে যাবে ওপারে। এই অঞ্চলের নাম মোংলা। সেখানে দাঁড়ানো ভ্যান চালককে বলবেন সিঙুড়বুনিয়া যাবেন। তারা একটু হেসেই আপনাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে সেই গ্রামে। ভ্যানে পা দুলিয়ে যেতে যেতে দেখবেন ছোট একটি গ্রাম্য বাজার। মোংলা নদীর পেট চিরে যাওয়া রাস্তা। রাস্তার দুই ধারে সুন্দরী গাছ।

সুন্দরী গাছ শুনে ভাবছেন, সুন্দরবনে চলে এলাম না তো! আপনি ঠিকই ভেবেছেন। এক সময় সুন্দরবন এই সিঙুড়বুনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন নেই। জনবসতি গড়ে উঠেছে। সুন্দরবনের আশেপাশে এমন অনেক গ্রাম। জনশ্রুতি আছে, এখানে দশক আগেও বাঘ ঢুকে পড়ত লোকালয়ে। তাড়া খেয়ে চলে আসত নিঃসঙ্গ হরিণ। বানর ঝুলত গাছে গাছে। এখন আসে না কেউ। বাঘের সংখ্যাও যে দিনদিন কমতির পথে! পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবনের কিছু চিহ্ন অবশ্য এখনো আছে গ্রামে। চারপাশে অসংখ্য কেওড়া, সুন্দরী, পাম গাছের সারি। একটি ঘর এখানে তো আরেকটি ঐখানে। মাঝখানে শুধু পানি আর পানি। এসব পানিতেই চাষ হয় 'হোয়াইট ডায়মন্ড' চিংড়ি। এখানের জীবিকা এখন চিংড়িঘের কেন্দ্রিক। সারাবছর সিঙুড়বুনিয়া পানিতে ভর্তি থাকে। আগে একসময় এসব ছিল ধানচাষের। হতো আরও নানা প্রকারের সবজিও। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ আয়লার পর মোংলা নদীর পানি ঢুকে পড়ে। সেই নোনা পানির কারণে চাষ বন্ধ হয়ে গেছে। খাবারের পানির কষ্ট আছে বটে এখানে, তবে দৃশ্যের অভাব নেই।

সিঙুড়বুনিয়া বাড়িঘরগুলো ছোট ছোট। অধিকাংশই সুন্দরী গাছ দিয়ে তৈরি। ঘর কালো কালিতে রঙ করা। মাটির মেঝে। নিয়মিত বন্যা হয় এখানে। জীবনমান খুবই সাধারণ। সেই সাধারণ জীবন নিয়ে, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে তারা বাঁচে। বিদ্যুৎ নেই। বাজার থেকে ব্যাটারি চার্জ করে আনে সকালে, রাতভর তাতেই বৈদ্যুতিক কাজকর্ম সারে। জেলেরা আছে। মোংলা নদীতে মাছ ধরে। কিশোরেরা বিকেলে স্কুলের মাঠে খেলে। গৃহিণীরা রাঁধে-বাড়ে। প্রতিবেশির সঙ্গে ঝগড়া করে। এই তো সিঙুড়বুনিয়া!

সব তো একই জীবন! আর পাঁচটা গ্রামের মতোই। আলাদা কোথায়? মহান রুশ সাহিত্যিক লেভ তলস্তয় বলেছিলেন, 'যা এক গ্রামে ঘটে, তা সব গ্রামেই ঘটে'। তলস্তয়ের কথা ধরে বললে, সিঙুড়বুনিয়া গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের জীবনের কোনো পার্থক্য নেই। সেই একই সূর্য, চাঁদ আর রাতদিন তো একই চিরকাল একই নিয়মে চলছে। এর ভেতরেও অবশ্য কিছু পার্থক্য আছে সিঙুড়বুনিয়া গ্রামে। এখানের মানুষ সুঠাম। পুড়ে যাওয়া গায়ের রঙ। প্রকৃতির সান্নিধ্যে বাঁচে। সভ্যতার উন্নয়নের সর্বগ্রাসী ছোঁয়া এখনো আসেনি এখনো। গ্রামের চারদিকে চিংড়িঘেরের পানি আর পানি। সেই পানির মধ্যে টঙঘর। টঙে বসে চিংড়িঘের পাহারা দেয় গ্রামের মানুষ। উড়িয়ে নেওয়ার মতো বাতাস চারদিকে। টঙেই মানুষ খায়দায়, ঘুমায়। আইল ধরে হেঁটে এপাড়া ওপাড়া ঘুরে বেড়ায় তরুণীরা। হিন্দু মুসলমান ভাইবোনের মতো এক গ্রামে মিলেমিশে থাকে।

উৎসব অবশ্য এখানে খুব জাঁকজমক করে না। তবু ঈদে সেমাই খেতে মুসলমান পরিবারে আসেন হিন্দুরা। আর মুসলমানরা ধুপধুনা নিয়ে দুর্গা পূজায় নাচে। এই সম্প্রীতি সিঙুড়বুনিয়ার প্রাণ।

সিঙুড়বুনিয়ায় ছিলাম চার রাত। কোনো কোনো রাতে বাতাসের দমকা হাওয়ায় উড়ে যেত মশারি। কখনো ঝুম বৃষ্টি। চারদিকে কাদা হয়ে যেত। সেই কাদা মেখে কিছু পাহারাদার কুকুর এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াত। বিড়াল আচমকা উঠে আসত বিছানায়। আর চিংড়ি ক্ষেতে বন থেকে উড়ে আসত বক আর হরেক রঙের পাখি। সিঙুড়বুনিয়ায় থাকতে থাকতে একদিন গেলাম সুন্দরবনে। বাগেরহাট বাজার হয়েই আমরা গেলাম পশুর নদীর পাড়ে। তখন মাত্র বর্ষাকালের শুরু। পশুর যেন ক্ষেপে রয়েছে। ৮০০ টাকা দিয়ে আমরা একটা ইঞ্জিনচালিত নৌকা নিয়ে চললাম সুন্দরবন দেখতে। নদীর মাঝে নৌকা চলে, ঢেউ এসে পানি ছিটা দিয়ে গা ভিজিয়ে দেয়। প্রায় ৪০ মিনিটের নৌভ্রমণ শেষে আমরা নামলাম।

পশুর নদীর কিনারায় ভাসতে দেখবেন অসংখ্য সুন্দরী ফল। পানির তোড়ে ভেসে ভেসে এসব অনেক দূরেও চলে যায়। এই ফল আবার চারা হয়ে জন্মায়। এভাবেই তৈরি হয় সুন্দরবন। এই ভাঙে এই গড়ে। সুন্দরবনে ঢুকতেই দেখবেন কেওড়া গাছের মূল। এবারই প্রথম আমার সুন্দরবন যাত্রা। কিন্তু হতাশই হলাম। ভেবেছিলাম, চারদিকে ঘনজঙ্গল দেখব। বাঘ হরিণের দৌড় দেখব। কিন্তু এ যে দেখি পার্ক! নামলাম করমজল নামের স্থানে। চারদিকে মানুষ গিজগিজ করছে। সারি সারি ইঞ্জিনচালিত বোট। মানুষ ছবি তুলছে। কেউ যাচ্ছে খামারের মতো গড়ে তোলা হরিণ দেখতে। কি আর করা! আমরাও হাঁটতে লাগলাম। এদিক ওদিক দেখছি। সুন্দরবনেরই একটা অংশ এটা। গভীর বনে যাওয়া অত সহজ নয়। অবশ্য যাওয়ার ইচ্ছে থাকল। পর্যটকদের সুবিধার জন্য করমজল অংশে এভাবে সাজানো। আরেকটু ভেতরে একটা তক্তা বিছানো সাঁকো। সেই সাঁকো ধরে হাঁটলে সুন্দরবনের ভেতরের কিছু রূপের স্বাদ পাওয়া যায়। অনেকে এখানে দাঁড়িয়ে ছবি তোলে। আর গাছে গাছে একটা দুইটা বানর ঝুলতে দেখা যায়।

এবার ফেরার পালা। ফিরেই আমরা বাগেরহাটের বাজারে একটি হোটেলে খেয়ে চলে গেলাম কবি রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বাড়ি দেখতে। বাংলাদেশে তার মতোন জনপ্রিয় কবি খুব কম এসেছেন। সত্তরের দশকের এই কবির হাত থেকে বেরিয়েছে 'আজও বাতাসে লাশের গন্ধ পাই'-এর কবিতা আর 'ভালো আছি ভালো থেকো'র মতো লিরিক। তুমুল জনপ্রিয় এই কবি মারা যান ১৯৯১ সালে। তাকে কবর দেওয়া হয়েছে বাগেরহাটের মোংলার মিঠাখালি গ্রামে। জন্ম বরিশালে হলেও এখানেই তার বেড়ে ওঠা। বিশাল জায়গাজুড়ে রুদ্রের মামার বাড়ি। এখানের প্রতিটি উঠোন, ঘরের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে রুদ্রের স্মৃতি। চারদিকে শান্ত, চড়ুই আর ঘুঘুর ডাক। বাড়ির পেছনে রুদ্র আর তার পরিবারের কয়েকজন সদস্য চিরকালের ঘুমে। তাদের ঘিরে বাঁশঝাড়। বাঁধানো কবরে একজন ঘাস কেটে দিচ্ছিল। যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও সময়ের অভাবে বাগেরহাটের বিখ্যাত ষাট গম্বুজ মসজিদ দেখা হয়নি আমাদের। তবে আপনারা অবশ্যই ইতিহাসের অনন্য এই স্থাপনা দেখতে ভুলবেন না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরও কত কী দেখার আছে!

পরদিন আমরা দুপুরে চললাম শুরুটা যেখানে হয়েছিল সেই খুলনা শহরে। এতদিন সিঙুড়বুনিয়ার একটি চেনা পরিবারের সঙ্গে ছিলাম। ফিরতে ফিরতে দেখলাম নির্মাণাধীন বিশাল রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র। যাওয়ার সময় অন্ধকার থাকায় এটা চোখে পড়েনি। শহরে এসে উঠলাম এক আবাসিক হোটেলে। খুলনা ছিমছাম শহর। তবে সন্ধ্যা নামতেই আলোকসজ্জায় যেন ভরে উঠে। মানুষের গুঞ্জন আর কোলাহল বেড়ে যায়। সেই কোলাহল ঠেলে রাতের খাবার খেতে আমরা টমটমে চড়ে গেলাম পাশের চুকনগরে। উদ্দেশ্য খুলনার বিখ্যাত চুঁইজাল খাওয়া। শুনেছি, চুঁইঝালের জন্য চুকনগরের আব্বাস হোটেল বিখ্যাত। আমরা সেখানে গেলাম কিনা আজ এতদিনে সেটা স্মরণে নেই। তবে ছিমছাম রেস্তোরাঁটির খাবারও ছিল বেশ স্বাদের। হাঁসের চুঁইঝালের মধ্যে আস্ত দেশি রসুনের মোলায়েম স্বাদও ছিল অনন্য। প্রথমবার চুঁইঝাল খাওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল দারুণ। ঢাকা শহরে অনেকবার চুঁইঝাল খাওয়া হয়েছে। তবে খুলনারটা বিশেষ কিছু। শোনা যায়, মোটরবাইক চালিয়ে বন্ধুকে নিয়ে এই চুঁইঝাল খেতে গিয়েই মাত্র ২২ বছর বয়সে ২০০৭ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান খুলনারই ছেলে বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার কাজী মানজারুল ইসলাম রানা। তার আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে।

হোটেলে ফিরে রাত্রিযাপনের পর আমরা বের হলাম খুলনা শহর দেখতে। ঘুরতে ঘুরতে শহরের নিউ মার্কেট থেকে কিছু কেনাকাটাও করা হলো। খুলনা শহরের ছিমছাম আবাসিক স্থানগুলোতেও হেঁটে দেখলাম। সন্ধ্যায় ফেরার বাস। তাই যা কিছু পাই চোখ দিয়ে দেখে মন দিয়ে গেঁথে নিচ্ছিলাম। খুলনা যাওয়ার পথের সেই পদ্মা ফেরি হওয়ার পর তো ঘরবাড়ির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। সন্ধ্যায় যখন বাস ছাড়ল তখন শুধু একটা কথায় ভেসে মনে পড়ছিল। এতদিন আমি কোথায় ছিলাম? সিঙুড়বুনিয়া নামে এত সুন্দর গ্রাম কি আদৌ আছে পৃথিবীতে? নাকি সব আমার কল্পনা! এরপর অভ্যেশবশত লিখলাম এই কয়েকটা পঙতি, 'ভূ-গোল এতোই ছোট যে তুমি কখনো তার পেটে/পাবে না সিঙুড়বুনিয়ার নাম; এতো হীন জাতক/তাদের ভালোবাসার কাছে নিজেকে ভেবেছি মহৎ।/সিঙুড়বুনিয়ার ঘরের দরজা সদা হাট খোলা থাকে/রাত্রিদিন এবং সেই দরজা দিয়ে বাঘ ঢুকে পড়ে/জানালা দিয়ে লাফায়। বিড়াল ও কুকুর পরস্পরে/বাছে শরীরের উকুন। এমন সে গেওয়াবরণ গ্রাম/গাঢ় রাত্রির বুকে মাঝি চিৎকার দিয়ে শুনায় তার নাম।'